Journal of Kolkata Society for Asian Studies : Vol. 11. No. 2, Dec. 2025

# Iswarchandra and Thakurdas: A Chronicle of a Father and his Son

*Satrajit Banerjee*

# Iswarchandra and Thakurdas: A Chronicle of a Father and his Son

*Satrajit Banerjee*

Iswarchandra's devotion to his mother, Bhagawati Devi, has been portrayed as a unique example that occupies a venerable position in the minds of the common Bengali populace. She is indeed revered as a glorified symbol of motherhood. In the hagiographical renderings of Iswarchandra, narratives of Bhagawati Devi's adoration of Iswarchandra are extensively visible. One of his biographers, his brother Shambhu Chandra, wrote that the affection shown by Bhagawati Devi towards Ishwarchandra was distinctly noticeable compared to that shown to other sons. Eventually, Bhagawati Devi is the major source of inspiration for various reformative endeavours of Ishwarchandra, such as the introduction of widow remarriage and combating conservatism and untouchability. In fact, his unflinching love for humanity, generosity, and compassionate attitude came from his mother. However, Ishwarchandra started living in Kolkata with his father, Thakurdas, from childhood till he finished his education and took up a job. Since he has spent the formative phases of his life with Thakurdas, it cannot be denied that his father had a significant and lasting impact on the formation of Ishwarchandra's outlook, attitude, and personality development. Yet, in Bengal, Ishwarchandra's mother is glorified to a great extent, while his father is largely overlooked. This article will try to review the existing perception by taking into account the intricacies of his relationship with his father.

**Keywords:** *Iswarchandra, Thakurdas, Bhagawati Devi, English-Sanskrit education, Widow Remarriage*

**সংক্ষিপ্তসার:** সাধারণ বাঙালি হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তির বৃত্তান্ত এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীকারদের আলোচনাতেও উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি ভগবতীদেবীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর অন্যতম জীবনীকার, সহোদর, শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন যে, অন্যান্য পুত্রদের তুলনায়, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি ভগবতীদেবীর স্নেহ প্রদর্শনের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হত। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের ভাগীদার এবং অনুপ্রেরণা ছিলেন ভগবতীদেবী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনে 'জননী জন্মভূমিশ্চঃ স্বর্গাদপী গরিয়সী' ছিল। কিন্তু বাস্তবে, ঈশ্বরচন্দ্র শিশুকাল থেকেই তাঁর বাবা, ঠাকুরদাসের সঙ্গে কলিকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন এবং শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করা থেকে শুরু করে চাকুরীতে যোগদান করা পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার সান্নিধ্যেই ছিলেন। তাই ঈশ্বরচন্দ্রের মানসলোকর গঠন বা চারিত্রিক গুণাবলীর ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে তাঁর পিতৃদেবের প্রভাব কোন অর্থেই অস্বীকার করা যায় না। অথচ বাঙালি সমাজে ঈশ্বরচন্দ্রের মা যতটা মহিমান্বিত, তাঁর বাবা তা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। বর্তমান প্রবন্ধে প্রচলিত এই ধারণার গন্ডি অতিক্রম করে একটি বিকল্প আখ্যান নির্মাণের প্রয়াস নেওয়া হবে।

**সূচক শব্দ:** *ঈশ্বরচন্দ্র, ঠাকুরদাস, ভগবতী দেবী, ইংরেজী-সংস্কৃত শিক্ষা, বিধবা বিবাহ*

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষীদের জীবনালেখ্য রচনাকারীদের আলোচনায় অধিকাংশ সময় বরেণ্য ব্যক্তিদের মাতৃভক্তির বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীকারদের আলোচনাতেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মা ও ছেলে' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। সতিকুমার নাগ 'বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী' নামক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে ঈশ্বরচন্দ্রের একাধিক জীবনীকার এবং বাংলার কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিদের লেখনীতে ভগবতীদেবীর চরিত্র-মাহাত্য আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চারিত্র পূজা' নামক গ্রন্থে ভগবতী দেবীর চরিত্র চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে তাকে 'লিথোগ্রাফপ্টে' প্রকাশিত 'দেবীমূর্তি' হিসেবে তুলনা করেছেন। (ঠাকুর ১৩৪৩:২১) এই বইটিতে ভগবতী দেবীকে নিয়ে একটি সুদীর্ঘ আলচনা রয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই দীর্ঘ আলোচনা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে, সে কারণে সমালোচকদের জিজ্ঞাসার জবাব-স্বরূপ এই প্রবন্ধের মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন "আশঙ্কা করিতেছি, সমালোচক মহাশয় মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণ বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু একথা তাহারা স্থির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে প্রভেদ নাই, তাহারা যেন পরম্পরের পুনরাবৃত্তি। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালোরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে।"(ঠাকুর ১৩৪৩: ২৪-২৫)

শ্রী নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বীরসিংহের সিংহ শিশু' গ্রন্থে 'মা ও ছেলের কথা' (পৃষ্ঠা ১৬৯ থেকে ১৭৮) নামের একটি অধ্যায় রয়েছে, কিন্তু ঠাকুরদাসকে নিয়ে পৃথকভাবে কোন অধ্যায় সেখানে নেই। শ্রী শরৎকুমার রায় রচিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থে 'ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক অধ্যায়টি মাত্র সাড়ে তিন পাতা জুড়ে, কিন্তু 'জননী ভগবতীদেবী' শীর্ষক অধ্যায়টির আলোচনা প্রায় নয় পাতা (পৃষ্ঠা ১২ থেকে ২০)। বিভিন্ন বন্ধুস্থানীয় এবং পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় মায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ঈশ্বরচন্দ্র অকুণ্ঠভাবে তাঁর মায়ের গুণকীর্তন করতেন এবং তাঁর জীবনে জননীর অবদানের বিষয়টি উল্লেখ করতেন। শরৎকুমার রায় লিখেছেন যে, মায়ের প্রসঙ্গ উঠলে ঈশ্বরচন্দ্র বলতেন,"আমি যদি মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশমাত্র পাইতাম তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি"। (রায় ১৩৪১: ১০২) ইংরেজিতে লেখা ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের জীবনী গ্রন্থে, রচয়িতা সুবল চন্দ্র মিত্র অবশ্য ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবতী দেবী উভয়কে নিয়েই পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখছেন, "মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের ডায়নামো।" (ঘোষ ১৯৮৪: ১৬) ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে গান্ধীজি লিখছেন, "আপনার মায়ের অনেক গুণ তিনি পেয়েছিলেন"। (গান্ধী ১৩৬৭:৩৬) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন (১৪ এপ্রিল, ১৮৯০) যার অস্তিত্ব এখনো রয়েছে। (অধিকারী ১৯৭০:২৩) কিন্তু ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এরকম কোন উদ্যোগ তাঁর তরফে দেখা যায়নি।

ঈশ্বরচন্দ্র, নিঃসন্দেহে তাঁর মা ভগবতী দেবীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছিলেন, "জননীরও সকল পুত্র অপেক্ষা অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ছিল"। (বিদ্যারত্ন ১৯৪৭: ৪০) প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ও কর্মকান্ডের ভাগীদার ছিলেন ভগবতীদেবী। বিধবা বিবাহের প্রচলনের সপক্ষে, গোঁড়ামী ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, সোচ্চার হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে ভালোবাসার দীক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা তিনি পেয়েছিলেন ভগবতী দেবীর কাছ থেকেই। চণ্ডীচরণ লিখছেন, "মায়ের কাছ থেকেই সেবা, পরোপকার, পরদুঃখকাতরতা, দান ও ত্যাগের স্বভাব পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর"। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৭: ২৫) এছাড়াও ভগবতী দেবীর করুণাময়ী রূপের

এবং তার স্নেহ, দয়া-মায়ার দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য এতটাই বেশি যে তার আলোচনা করতে গেলে এখানে স্থানসংকুলান হবে। বিহারিলাল, চণ্ডীচরণ প্রমুখের লেখাতে বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাসাগরের করুণা সাগর হয়ে ওঠার পশ্চাতে ভগবতী দেবীর অপরিসীম প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে মাত্র আট বছর বয়সে তার বাবার সাথে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন (১৮২৮, নভেম্বর); এরপর প্রায় বারো-তেরো বছর তিনি পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে কাটিয়ে ছিলেন (১৮২৯-১৮৪১ পর্যন্ত, অধ্যয়ন এবং পরে চাকুরিতে যোগদান করার পর ঈশ্বরচন্দ্র তার বাবাকে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন)। অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভিক পর্বটা অতিবাহিত হয়েছিল ঠাকুরদাসের সাহচর্যে। এই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক পর্বটিতে, অর্থাৎ চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের এই পর্যায়ে সন্তান যার সান্নিধ্যে থাকবে তার চরিত্রের উপর সেই ব্যক্তির প্রভাব ও অবদান সবচেয়ে বেশি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার, অন্যদিক থেকে বলা যেতে পারে, যে শিশু মাত্র আট বছর বয়সে মায়ের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, তার অপরিণত মনের উপর মায়ের প্রভাব কতটা গভীর ও সুদুর প্রসারী হবে—সে সম্পর্কে দ্বিধার অবকাশ থেকেই যায়। সুতরাং সঙ্গত ভাবেই প্রশ্নটা ওঠে যে, শৈশবে মায়ের সঙ্গ ছেড়ে বাবার তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা সত্ত্বেও, বাঙালী সমাজে ঈশ্বরচন্দ্রের মায়ের তুলনায় তাঁর বাবার সমাদর অনেকটাই কম।

ঈশ্বরচন্দ্রের যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন ঠাকুরদাস তাঁকে লেখাপড়া শেখার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন—তাঁর নাম ছিল কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শম্ভুচন্দ্র লিখেছিলেন, 'কালীকান্ত অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন। শিশুগণকে শিক্ষা দেবার বিশেষরূপ জানিতেন এবং শিশুগণকে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ করিতেন। সে কারণে ছোট ছোট বালকগণ তাহার নিকট সর্বদা অবস্থিতি করিতে চাহিত'। (বিদ্যারত্ন ১৯৪৭: ১৫) বিদ্যাসাগর তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী, শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ নিপুন ও যত্নবান ছিলেন। ইহার পাঠশালার ছাত্ররা, অল্পসময়ে উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিত। এজন্য তিনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন"। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১: ২৯) কিন্তু এহেন পারদর্শী মাষ্টারমশাই-এর ভীটে বীরসিংহ গ্রাম হলেও তিনি প্রায়শই পরিভ্রমনে যেতেন। শম্ভুচন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী, কালীকান্ত ছিলেন ভঙ্গকুলীন এবং বহুবিবাহে আসক্ত। শ্বশুর বাড়ী থেকে প্রাপ্য আদায়ের দিকে তাঁর নজর ছিল বেশী। কালীকান্তকে নিজের পুত্রের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করার জন্য ঠাকুরদাস ভদ্রেশ্বর ও শ্রীরামপুরে খোঁজ করে তাঁকে নিয়ে আসেন এবং বীরসিংহ-এ একটি পাঠশালাও খুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। (বিদ্যারত্ন ১৯৪৭: ১৫) সুতরাং ঠাকুরদাস পুত্রকে উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষাদানের জন্য প্রারম্ভিকপর্ব থেকেই সচেতন ছিলেন। আবার ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে কালীকান্ত মহাশয়ের শিক্ষকতার যথেষ্ট গুণকীর্তন করেছেন। তবে শম্ভুচন্দ্র, চণ্ডীচরণ, বিহারীলাল প্রমুখের মতানুযায়ী এ গ্রামের আরেকটি পাঠশালার শিক্ষক, সনাতন বিশ্বাস, শিক্ষার্থীদের বেদম প্রহার করতেন। সে কারণে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁকে এ পাঠশালায় পাঠানো সমীচিন মনে করেননি। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র নিজের দুরন্তপনা, জেদ এবং আরও নানা কারণে পিতার কাছেই যৎপরনাস্তি মার খেয়েছেন।

যাইহোক ঈশ্বরচন্দ্রের পড়াশোনায় অভাবনীয় প্রতিভা লক্ষ্য করে পন্ডিত কালীকান্ত বলেছিলেন যে, কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে এবং তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরেজী/পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। (বিদ্যারত্ন ১৯৪৭: ১৭) অতঃপর কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং একজন ভৃত্য সহযোগে ঠাকুরদাস ছেলেকে নিয়ে ১৮২৮ সালের নভেম্বরে (মতান্তরে, ইংরেজির ১৮২৯ সাল ও বাঙ্গালা ১২৩৫ সালের কার্তিক, বিদ্যারত্ন ১৯৪৭: ১৭) কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং ভগবৎচরণ সিংহের পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ-এর বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এরপর ১৮২৯ সালের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্রকে পিতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। এখানে দুটি দ্বিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন ঠাকুরদাস। সংস্কৃত কলেজের ভর্তির সময় ঠাকুরদাস দুটি প্রশ্নে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন—প্রথমটি ছিল ছেলেকে পড়ানোর জন্য কলিকাতায় নিয়ে যাওয়ার ভাবনা এবং দ্বিতীয় সংশয়ের বিষয়টি ছিল ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হবে নাকি সংস্কৃত শিক্ষা।

ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবটি ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতা রামজয়কে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ঠাকুরমা দুর্গাদেবী তা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ওই একরত্তি ছেলে যাবে কলকাতায় পড়তে?...কলকাতায় না গেলে কি মানুষ হয় না?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'না তা হয় না... কলকাতায় কত স্কুল, কত কলেজ'! বস্তুতপক্ষে রামজয় তার পুত্র ঠাকুরদাসের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছিলেন (বাগচি, ১৯৪৬:১৮)। আসলে "তৎকালে এ প্রদেশে কাহারও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতা যাইবার রীতি ছিল না" (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ১৭)। কিন্তু উপার্জনের জন্য দেশান্তরে যাওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত ছিল না। ঠাকুরদাস স্বয়ং পরিবারের অনটন মেটানোর জন্য কলিকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া শেখানোর জন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রচলিত দেশাচারের বিপ্রতীপ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরদাসের এই বিচক্ষণ ও সাহসী পদক্ষেপ ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের "বিদ্যাসাগর" হয়ে ওঠার প্রথম সোপান। উল্লেখ্য, ঠাকুরদাসের পরিবারের দারিদ্রের মোচন তখনও হয়নি বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসেন। ঠাকুরদাস কিন্তু পুত্রকে কলিকাতায় অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশায় নিয়ে যাননি, লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানেই পিতৃত্বের মহত্তর কর্তব্য সম্পর্কে ঠাকুদাসের দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। প্রসঙ্গত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর যদি...ইংরেজের সংস্পর্শে না আসিতেন; চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা শহরের অবস্থাটা ঠিক এমনি না হইতে পারিত;...'। (ত্রিবেদী ১৩২০:৮) তার এই বক্তব্যটির নিহিতার্থ হল, ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতায় আগমন তার ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল।

দ্বিতীয় সংশয়ের বিষয়টি ছিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ—ঈশ্বরচন্দ্রকে লক্ষ্মী-উপার্জনকারী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করা হবে, নাকি তাদের পারিবারিক শিক্ষাগত ঐতিহ্যের ধারা বজায় রেখেই সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করা হবে। এই বিষয়ে তিনি নিজে যেমন অনেক অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেছিলেন, তেমনি অনেক আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়িদের কাছ থেকে পরামর্শও নিয়েছিলেন। অবশেষে প্রায় একমাস ধরে নানারকম ভাবনা চিন্তা করে এবং প্রস্তাবগুলিকে বিবেচনা করে ঠাকুরদাস ছেলেকে সংস্কৃত পড়ানোর মনস্থ করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি কতটা দুরূহ ছিল তা উপলব্ধি করার জন্য ইংরেজি শিক্ষার সপক্ষে যে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলি প্রসঙ্গক্রমে এসেছিল—তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের বক্তব্য হল, ঠাকুরদাস ১৪/১৫ বছর বয়সে উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় গিয়েছিলেন। সেই সময় মোটামুটি ইংরেজী জানা থাকলে সওদাগরি সাহেবদের হৌসে অনায়াসে চাকরী জুটত। যদিও ঠাকুদাসের নিজস্ব ইচ্ছা ছিল সংস্কৃত শিক্ষা করার, কিন্তু তাঁর পরিবারের অর্থনৈতিক দৈন্যতার কথা স্মরণ করে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১: ৯-১০) সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার কার্যকারিতা সম্পর্কে তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে কলিকাতায় আসার সময়ও বীরসিংহের পরিবারের বিশেষ আর্থিক উন্নতি হয়নি। সুতরাং পুত্রকে একইসঙ্গে শিক্ষাদান করা ও উপার্জনক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার উপযুক্ততা নিয়ে বিশেষ প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। তাছাড়া, তাঁর পিতা যখন অন্যান্যদের কাছে মাইলস্টোন দেখে ইংরেজী সংখ্যামালা চিনে নেওয়ার অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন, তা শুনে তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁরা প্রস্তাব দেন যে, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে হে' সাহেবের অবৈতনিক বিদ্যালয়ই (হেয়ার সাহেবের স্কুল) হবে উপযুক্ত নির্বাচন। সেখানে ভালোভাবে ইংরেজী আয়ত্ত করতে পারলে পরে বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে পড়তে পারবে। আর যদি মোটামুটি কাজ চালানোর মতো শিখে নিতে পারে তাহলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে অথবা সাহেবদের বড়ো বড়ো দোকানে অনায়াসে কাজ করতে পারবে। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা করাই বিধেয় ছিল। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১: ৫০-৫১)

শম্ভুচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, ঠাকুরদাস প্রাথমিকভাবে স্থির করেছিলেন, ছেলেকে হিন্দু কলেজে পড়াবেন। কিন্তু আত্মীয়রা প্রশ্ন তুলেছিলন মাত্র দশ টাকা বেতনে এ ধরনের খরচ সাপেক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলেকে পড়ানো বেশ কষ্টসাধ্য। সেক্ষেত্রে ঠাকুরদাস বলেছিলেন যে, ৫ টাকা তিনি বীরসিংহে পাঠাবেন এবং বাকী ৫ টাকায় তিনি ছেলের কলেজের মাসিক বেতন দেবেন। এই পরিকল্পনা শুনে অনেকে আবার চোরবাগানে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত কম খরচসাপেক্ষ ইংরেজী বিদ্যায়তনে ছেলেকে ভর্তি করার ব্যাপারে ঠাকুরদাসকে বিবেচনা করে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। (বিদ্যারত্ন ১৯৪৭: ১৯)

দেশজ ঐতিহ্যের ধারক সংস্কৃত শিক্ষার প্রসঙ্গে তাঁদের যুক্তিগুলির দিকে নজর ফেরানো যাক।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্বরচিত জীবনীগ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১: ৫১) কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুন ঠাকুরদাসের সংস্কৃতের সাধনার বাসনা অপূর্ন ছিল। সেকারনে ঠাকুরদাসের অভিলাষ ছিল যে, পুত্র সংস্কৃত শিখে চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপনা করবে। তার পিতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন, "তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপনা করিব...তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠি করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া তিনি আমায় ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন"। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১: ৫১-৫২) ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত শিক্ষার বিষয়ে মধুসূদন বাচস্পতির সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। বাচস্পতি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের মায়ের মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষনের কাকার ছেলে এবং তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করতেন। বাচস্পতি বলেছিলেন, সংস্কৃত কলেজ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র অনেক উত্তমরূপে অভিপ্রেত শিক্ষা লাভ করতে পারবে এবং তা চতুস্পঠীর থেকে অনেক ভালোভাবে ও সত্ত্বর শিখতে পারবে। এছাড়াও চাকরির প্রয়োজন হলে, ল'কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে আদালতে জজ-পন্ডিতের পদে নিযুক্ত হতে পারবেন। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১:৫২)

শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন জগদ্দর্লভ বাবুর বাড়ীতে থাকার সময় ঠাকুরদাসের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের তৃতীয় শ্রেণির অধ্যাপক, পন্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, কলেজর ভর্তি হওয়ার পাঁচ-ছয় মাস পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্তে ৫/- টাকা বৃত্তি পেতে পারবে। পুত্রের প্রতিভার প্রতি আস্থাশীল পিতা নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বৃত্তি পাবে। (বিদ্যারত্ন ১৯৪৭: ২২) পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র ৫/-টাকা ও আট টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করতো। এছাড়াও বিদ্যার্থী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র একাধিক আর্থিক পুরস্কারও পেয়েছিলেন যার মূল্য সেই সময়ে বাজার দরের নিরিখে বেশ বড়োসড়ো অঙ্ক ছিল। বৃত্তির ওই টাকা পরিবারের কাজেও লাগত, পুস্তক কেনার জন্যেও ব্যাবহৃত হয়েছিল, আবার এ টাকায় কিছু ধান—জমিও কেনা হয়েছিল। ঠাকুরদাস সমসাময়িক যুগে প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার কুফল সম্পর্কেও বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। সেই সময়, হিন্দু কলেজে পাঠরত এবং সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন এমন অনেক ভদ্রবংশের বুদ্ধিমান ও কৃতি হিন্দুসন্তানের বিশেষ অধঃপতন ঘটেছিল। এই কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে হিন্দুস্কুলের শিক্ষার্থীদের অধোগামীতার বর্ণনা উপস্থাপিত করেছিলেন। বিহারীলাল বলেছেন, "তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষার কুফল সন্দর্পনে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা বোধহয় ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী পড়িয়া, তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় বিকৃত হইয়া না পড়ে, ইহাই ঠাকুরদাসের উদ্দেশ্য ছিল। (সরকার ১৩২৯: ৫৭)

অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্র নয় বছর বয়সে পটলডাঙ্গায় গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। ঠাকুরদাসের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্র কুলধর্মসম্মত সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এতে ঠাকুরদাসের দীর্ঘকাল-লালিত বাসনা চরিতার্থ হয়েছিল। কিন্তু নিজের আক্ষেপ পূরণ করার পাশাপাশি ঠাকুরদাস কিন্তু কখনই পুত্রের

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার বিষয়টিকে উপেক্ষা করেননি। তিনি বরং চেয়েছিলেন যে, ছেলে পন্ডিত হোক এবং উপার্জনক্ষম হোক।

ঠাকুরদাস কলিকাতায় থাকার সময় চাকুরি করতেন এবং স্বপাক ভোজন করতেন। কিন্তু পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে ভর্তি করার পর ঠাকুরদাসের দৈনন্দিন জীবনে বিস্তর পরিবর্তন এসেছিল। প্রথম ছয়মাস ঠাকুরদাসের দিনলিপি সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "পিতা প্রত্যেক দিন সকাল ৯ টার মধ্যে পুত্রকে স্নানাহার করিয়ে কলেজে পৌঁছে দিতেন। তারপর নিজের কর্মস্থলে যেতেন। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ২৩) আবার বিকেল চারটার সময় ছেলেকে নিয়ে বাসায় রেখে আবার নিজের কাজে যেতেন। এই সময় কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে কিন্তু রান্না করতে হত না। রান্নার যাবতীয় ভার ছিল ঠাকুরদাসের উপর। রাত্রিবেলা ৯টার সময় বাসায় ফিরে তিনি পুনরায় রান্না করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন সাহিত্য শ্রেণিতে উঠেছিলেন (দ্বাদশ বছর বয়স, শম্ভুচন্দ্র) তখন থেকে তাকে একবেলা রান্না করতে হত। এসময় তাঁকে গৃহস্থলীর কাজও করতে হত। এছাড়া ঈশ্বরকে বাজার করা, বাসন মাজা, মশলা কোটা দুবেলা রান্না করতে হত। কারণ আর্থিক অনটনের জন্য তার  পরিবারের পক্ষে ঝি-চাকর রাখা সম্ভব হয়নি। (সরকার, ১৩২৯:৭৩) অলঙ্কার শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে দুইবেলা রান্না করতে হত। (সরকার, ১৩২৯: ৮৭) সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা, তাকে প্রায় দুইমাইল দূরবর্তী সংস্কৃত কলেজে পৌছে দেওয়া, আবার ওই একই পথ অতিক্রম করে বাসায় ফিরে আসা, তারপর জীবিকা স্থলে যাওয়া, বিকেল ৪টার সময় কর্মস্থল থেকে ছেলেকে আনতে যাওয়া, বাসায় ফিরে আবার কাজে বেরোনো এবং রাত্রে বেলায় ৯টার সময় রান্না করা—এই ছিল ঠাকুরদাসের প্রথম ৬ মাসের দিনলিপি। এরপর যখন তাঁদের বড়বাজারের বাসা থেকে কলেজের রাস্তা চিনে যেতে সমর্থ হলেন, তখন ঠাকুরদাস তাঁকে একা ছাড়তে লাগলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র নৈমিত্তিক পাঠাভ্যাস ঠিকমতো বজায় রেখেছে কিনা সে ব্যপারে ঠাকুরদাস বিশেষ যত্নবান ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন "তিনি কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণিতে প্রবেশ করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ যাহা পড়িতেন প্রত্যহই তাহা পিতার নিকট বলিতে হইত। ...১০/ ১৫ দিন পরে তিনি যাহা বিস্মৃত হইতেন তাহা পিতা অবিকল বলিয়া দিতেন"। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:২৪) এছাড়াও ঠাকুরদাস প্রত্যেকদিন শেষ রাত্রিতে ছেলেকে ঘুম থেকে উঠিয়ে উদ্ভট সংস্কৃত কবিতা মুখে মুখে শেখাতেন এবং এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় দুইশত সংস্কৃত শ্লোক শিখেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের আবার রাত্রিবেলায় পড়াশোনার অভ্যেস ছিল। তিনি চেষ্টা করতেন রাত্রি বেলায় ১০টার মধ্যে শুয়ে পড়তে এবং বাবাকে বলতেন নিকটস্থ আর্মানি গীর্জার ঘড়িতে বারোটা বাজলে, তাকে যেন জাগিয়ে দেওয়া হয়। ঠাকুরদাস ওই দুইঘন্টা অর্থাৎ রাত্রি দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকতেন। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:২৫-২৬) হাজার কাজে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ঠাকুরদাস, ছেলের পড়াশোনার জন্য প্রায়শই এই অতিরিক্ত দুই ঘন্টা জেগে থাকার কৃচ্ছসাধনকে এক অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব হিসাবেই পালন করতেন। বস্তুতপক্ষে ছেলের পড়াশোনার জন্য যে কোনো রকম সহযোগিতা করতে ঠাকুরদাস সবসময় তৎপর থাকতেন। আবার মাঝেমধ্যে তাঁকে ছেলের প্রতি বিশেষ কঠোর হতেও দেখা যেত। যেদিন বাড়ি ফিরে দেখতেন যে, প্রদীপ জ্বলছে কিন্তু ছেলে ঘুমোচ্ছে, তখন নির্বিচারে প্রহার করতেন। ঠাকুরদাসের সেই প্রহার এতটাই মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যেত মাঝে মাঝে গৃহস্বামী তিরস্কার করে বলতেন, পুত্রকে এরূপ প্রহার করলে তাকে বাসা পরিত্যাগ করতে হবে। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:২৪)

ঠাকুরদাস ছেলের উপার্জনের বিষয়টি নিয়ে অগ্রিম চিন্তাভাবনা করে রেখেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মাসিক বৃত্তির অর্থ এবং বিভিন্ন সময় উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য যেসকল আর্থিক পুরস্কারগুলি পেতেন সেগুলিকে ঠাকুরদাস সঞ্চয় করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল টোল তৈরি করার জন্য জমি কেনা। টোলে দেশীয় গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি, ঐ জমির উপসত্ব থেকে যে আয় হবে, তা দিয়ে গ্রামের বাইরে থেকে আসা ছাত্রদের ভরণপোষণ করা হবে—এই ছিল ঠাকুরদাসের অভিলাষ। পরবর্তীকালে ঠাকুরদাস ঐ টাকায় কাঁচিয়া গ্রাম সহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েক বিঘা জমি কিনেছিলেন। জমি

কেনার পর উদ্বৃত্ত টাকা তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের বই কেনার জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। এখানে ঠাকুরদাসের বিষয়-আশয় নিয়ে বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। তিনি ছেলের ভবিষ্যতের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের বিষয়ে যতটা যত্নবান ছিলেন, তেমনি ছেলের পড়াশোনার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস অর্থাৎ পুঁথিপত্র কেনার প্রয়োজনীয়তাকেও সমান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, মুদ্রণ প্রযুক্তির উৎকর্ষতা তখনও সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ অনেক পুঁথি তখনও মুদ্রিত হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই অনেক সংস্কৃত পুথির অনুলিপি তৈরি করতেন। এই কাজটা ছিল সময় সাপেক্ষ ব্যাপার (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:২৮)। ঠাকুরদাস হয়তো অনুমান করেছিলেন যে, ছেলে পুঁথি কেনার সঙ্গতি অর্জন করতে পারলে, অনুলিপি করার জন্য অযথা সময় নষ্ট সময় হবে না এবং ঐ উদ্বৃত্ত সময়টা তিনি নিজের পাঠাভ্যাসের কাজে লাগাতে পারবেন। এ'সময় ঈশ্বরচন্দ্র একাধিক হাতে লেখা পুঁথি কিনেছিলেন, যেগুলি তার নিজস্ব গ্রন্থাগারে সংগৃহিত হয়েছিল। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ৩১)

ঈশ্বরচন্দ্র বরাবরই তাঁর পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। যদিও জীবনের শেষপর্বে বিভিন্ন রকম জটিলতার কারণে তিনি পরিবারের থেকে দূরে কারমাটারে একাকী জীবন কাটাতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু পরিবারের সব সদস্যদের - মা, বাবা, ভাই, পুত্র, পুত্রবধূ - সকলের আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তিনি প্রতিমাসে প্রত্যেকের ব্যয়-নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করতেন। (ঘোষ, ১৯৮৪: ৪৫৫-৪৬০) তাঁর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদেরকে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে এই বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি তিনি পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের পড়াশোনার সংবাদও নিতেন। তবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার ক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা যে কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের উইল পাঠ করলে দেখা যাবে সেখানে নিকটাত্মীয়, দূঃসম্পর্কিত আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, এমনকি আশ্রিতদের জন্যও অর্থ বন্টনের উল্লেখ রয়েছে। (ঘোষ, ১৯৮৪: ৩৮৭-৩৮৮) পরবর্তীকালে নানাবিধ কারণে (যার অন্যতম কারণ ছিল বিধবা বিবাহ প্রদান করা) ঋণগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও, ঋণ খেলাপির তকমা যাতে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের উপরে না লাগে এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তার পরিবারের কেউ যাতে অসম্মানিত না হয়, সে কারণে তিনি নানারকম উপায়ে ঋণ মুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন। (ঘোষ, ১৯৮৪: ৪৫৭)

পরিবারের প্রতি নিষ্ঠাসহকারে ঠাকুরদাসের দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত ঈশ্বরচন্দ্র স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি আত্মজীনচরিতে উল্লেখ করেছেন যে, চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে ঠাকুরদাস পারিবারিক অনটনের সুরাহা কারার জন্যেই কলিকাতায় গিয়েছিলেন। এজন্য তিনি নিজের সংস্কৃত সাধনার বাসনাও বিসর্জন দিয়েছিলেন। কলিকাতায় অতিকষ্টে, অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে তিনি অর্থসংস্থানের বন্দোবস্ত করেছিলেন। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯১: ৮-১০) তিনি যখন দুই টাকা মাসিক বেতনের চাকরি পান তখন পুরো টাকাটাই বীরসিংহের পরিবারে পাঠাতেন। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯১:১৭) ঠাকুরদাস তাঁর সামান্য রোজগার সত্ত্বেও ছেলেদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করার জন্য একে-একে তিন ছেলেকেই কলিকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকের উচ্চশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। প্রত্যেক সন্তানকে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন। মেজো ছেলে দীনবন্ধুর বিয়ে দেওয়ার সময় ঠাকুরদাস ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সে'সময়ও তিনি বীরসিংহে যে টাকাটা পাঠাতেন তা কমাননি, বরং কলিকাতার বাসার খরচ কমিয়েছিলেন। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ৪১-৪২) শম্ভুচন্দ্র লিখেছিলেন যে, এ'সময় কলিকাতার বাসার সদস্যরা খুব কষ্টেই দিনাপাত করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এরকম একজন পরিবারসর্বস্ব দায়িত্ববান ব্যক্তিকে পিতা হিসাবে পেয়েছিলেন। সে'কারণেই হাজারও সমস্যা সত্ত্বেও পারিবারিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি।

পরিবারের মধ্যে সবথেকে বেশি দায়িত্বশীল পুত্র হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর অটুট আস্থা ছিল ঠাকুরদাসের। ঈশ্বরচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের ঋণগ্রস্থতা এবং তার পত্নি ও সংসারের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করে ঠাকুরদাস যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সে'কথা পিতার কাছ থেকে জানতে পেরে ঈশ্বরচন্দ্র তার দ্রুত সমাধান করতে তৎপর হয়েছিলেন। এছাড়াও

তাঁর তৃতীয় কন্যা বিনোদিনী দেবীর স্বামী বাবু সূর্য কুমার অধিকারীকে হাই স্কুলের শিক্ষকতার কাজ ছাড়িয়ে মেট্রোপলিটনের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করেছিলেন। জামাতার সামাজিক প্রতিপত্তির ব্যাপারেও তাঁর সমান নজর ছিল। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ২১৭) ১৮৪১ সাল থেকে ঠাকুরদাস কলকাতা ছেড়ে বীরসিংহ গ্রামে যৌথ পরিবারে বসবাস করা শুরু করেছিলেন। সেই পরিবারের দৈনন্দিন খরচ-খরচার হিসাব রাখার দায়িত্ব তিনি তাঁর পিতার ওপর অর্পণ করেছিলেন। যদিও বীরসিংহের যৌথ পরিবারের যাবতীয় ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতেন ঈশ্বরচন্দ্র। আবার ওই একই সময়, কলকাতার ভাড়া বাড়িতে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তার দুই ভাই—দীনবন্ধু এবং শম্ভুচন্দ্র থাকতেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরচন্দ্র তাদেরও যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১: ২৪৯)

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতার প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিলেন। সেই সময় বেশিরভাগ বয়স্ক মানুষদের মধ্যে তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছে থাকতো। ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁর পিতাকে গয়াধামে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১২৬৫ সালে ঠাকুরদাস দীনবন্ধু কুম্ভকারের সঙ্গে তীর্থ ভবনে গিয়েছিলেন। প্রায় এক বছর ধরে কাশি, কানপুর, এলাহাবাদ, মথুরা প্রভৃতি একাধিক স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। বিভিন্ন তীর্থস্থল ভ্রমণ করবার সময় ঠাকুরদাস তাঁর পুত্রের গুণকীর্তন শুনে যথেষ্ট আহ্লাদিত হয়েছিলেন এবং সে কথাগুলি তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে চিঠি মারফত লিখে জানিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরই, "অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে পিতৃদেব ত্বরায় দেশে পুনরাগমন করেন"। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ১৫৫) কিন্তু একটু বেশি বয়সে যখন ঠাকুরদাস কাশী বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের কাছে সে ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি ঠাকুরদাসের কাশী বাসের বাসনাকে সমর্থন করার জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের প্রতি তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন, "তিনি (ঠাকুরদাস) বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিবেন, তাহা কোনো মতেই পরামর্শসিদ্ধ নহে, সমুদায় আহরণ করিয়া আপনার আহারাদি নির্বাহ করিবেন, তাহাতে কর্মের একশেষ হইবে,....তিনি শেষ বয়সে একাকী বিদেশে কালহরণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় কী হইতে পারে? সুতরাং এ অবস্থায় তিনি একাকী কাশীতে বাস করিবেন, ইহা আমি কোনোমতে সহ্য করিতে পারিব না। সেরূপ করিলে তাহার কষ্টের শেষ থাকিবে না"। (ঘোষ, ১৯৮৪: ৪৪৯) তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ও তার স্ত্রীর সঙ্গে ঠাকুরদাসকে কাশীতে পাঠান এবং সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয় (১লা বৈশাখ, ১২৮৩ সাল)। তাঁর ভাইরা কলকাতায় ফিরে গিয়ে শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতে সায় দেননি। কারণ ঠাকুরদাসের অন্তিম ইচ্ছা ছিল 'আমার অন্তিম সময় জেষ্ঠপুত্র নিকটে থাকিবে ও দাহাদিকার্য সম্পন্ন করিয়া কাশিতেই অদ্য-শ্রাদ্ধ করিবে'। সেই নির্দেশমাতা কাশীতে দশ দিন থেকে শ্রদ্ধাধি সম্পন্ন করে কলকাতায় ফেরেন। পরে আবার কাশীতে গিয়ে পিতার নির্দেশ মতো মারাঠি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের ভোজন করেছিলেন। (সরকার, ১৪১৬:২৭)

ঠাকুরদাস পুত্রের ধীশক্তির উপর যেমন আস্থাশীল ছিলেন, তেমনি তার কর্তব্যপরায়ণতার ওপরও দৃঢ় আস্থা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরীতে (১৮৪১, ২৬ শে ডিসেম্বর) যোগদান করার পর পিতাকে কর্ম থেকে অবসর নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকার অনুরোধ করেন। ঠাকুরদাস সেই অনুরোধ বজায় রেখে চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে মনস্থ করেছিলেন। তাঁর মনিব এই পদক্ষেপকে অবিমৃষ্যকারিতা মনে করেছিলেন। মনিব আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে যদি ছেলের মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক হয়, তখন ঠাকুরদাসকে অনোন্যপায় হয়ে চাকরীর সন্ধান করতে হতেও পারে। প্রত্যুত্তরে পুত্রের ওপর প্রত্যয়শীল পিতা বলেছিলেন, "আমার পুত্র সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মশীল এবং আমায় দেবতুল্য জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তাহার কথা অবহেলা করিতে পারিব না। তাহাকে যদি অধার্মিক-দুশ্চরিত্র জানিতাম, তাহা হইলে কখনই কর্ম ত্যাগ করিতাম না"। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ৫১) ঠাকুরদাস তার বড়ো ছেলেকে ঠিক যেভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও কর্তব্যবোধ সেভাবেই গড়ে উঠেছিল।

পিতার কথা পুত্র শুনতেন এবং নিঃশর্তে আজ্ঞা পালন করতেন। সেকারণে ল'কমিটি পরীক্ষায় পাশ করে ত্রিপুরায় জজ-পন্ডিতের চাকুরি পাওয়া সত্ত্বেও পিতার নির্দেশে ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে যোগদান করেননি। (বিদ্যারত্ন ১৯৪৭: ৩৬) অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক উপার্জনক্ষম পুত্রের অনুরোধও যে উপেক্ষনীয় নয়, তা ঠাকুরদাস বুঝতেন। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সম্মান, সমাদর ও কর্তব্যপরায়ণতা—এই নিয়েই গড়ে উঠেছিল ঠাকুরদাস ও ঈশ্বরচন্দ্রে সম্পর্কের রসায়ণ।

স্ত্রী'জাতির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে পিতার কাছে থেকে শোনা একটি গল্পের কথা বলা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন যে, "একদিন ঠাকুরদাস খিদের জ্বালা ভুলবার জন্য কলিকাতার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোর ফলে খিদে আরো বেড়ে গিয়েছিল এবং ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তিনি একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই দোকানে কর্মরত এক মধ্যবয়স্ক বিধবা মহিলা উপযাচক হয়েই ঠাকুরদাসের খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওই মহিলা ঠাকুরদাস কে বলেছিলেন, 'যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯১: ১৫) এই ঘটনা শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের মন্তব্য ছিল, "পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া আমার...স্ত্রী জাতির উপর...প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়া ছিল। ওই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনোই, এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করতেন না।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯১: ১৬)

বিদ্যাসাগরের জীবনের "সর্ব প্রধান সৎকর্ম" অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে তাঁর পিতামাতার প্রভাব সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যাক। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সাধারণত লোকের একটা ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগর মশায়ের মাতার আগ্রহে এই বিধি (বিধবা বিবাহ প্রচলন) প্রচলিত করা হয়; কিন্তু আমি বিদ্যাসাগর মহাশয় এর মুখে একটু অন্যরূপ শুনিয়াছি।' বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে নিজে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে তা বাস্তবায়ণের উদ্যোগ নেওয়ার পূর্বেই বিদ্যাসাগর তার মাতার সন্নিকটে নিজের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ভগবতী দেবীও বিধবার পুনর্বিবাহের শাস্ত্রীয় নিদানের ব্যাপারে ছেলের কাছ থেকে আশ্বস্ত হওয়ার পর বলেছিলেন, "তবে আমি তোকে বারণ করি না, তুই এ'কাজ কর গে যা। যে যা বলে বলুক"। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৭: ৫২৩) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বক্তব্যে দুটি বিষয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য ভগবতী দেবীর পক্ষ থেকে আগাম কোন উপরোধ বা নির্দেশ বিদ্যাসাগরের কাছে আসেনি। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন ভূমিকার কথা কৃষ্ণকমলের লেখাতে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ ঈশ্বরচন্দ্রের অপর এক জীবনীকার, চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল যে, "মা ও ছেলে" নামক গ্রন্থটির প্রুফ বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং দেখেছিলেন এবং, চণ্ডীচরণ লিখছেন, "বিধবা বিবাহ বিষয়ে তাহার জননীর কতটুকু সম্বন্ধ ছিল, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে সেখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার জননীর অনুরোধের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৭: ৬৩-৬৪) বীরসিংহ গ্রামের জনৈকা বালিকা বিধবার দুঃখে কাতর হয়ে ভগবতী দেবী তার পুত্রকে বিধবাদের পুনর্বিবাহের শাস্ত্রসম্মত বিধি অনুসন্ধানের কথা বলেছিলেন কিনা, সে ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন বিহারীলাল। তবে তিনি আবার নারায়ণবাবুর কাছ থেকে শুনেছিলেন যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের শাস্ত্রীয় নিদান সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রের বক্তব্যকে নির্ভুল বলে মনে করতেন ভগবতী দেবী। (সরকার, ১৩২৯: ৩২৭) চণ্ডীচরণের বক্তব্যের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা বিবাহের প্রচলন সম্পর্কিত যে বইটি লিখেছিলেন সেটি প্রকাশনার পূর্বে ভগবতী দেবীর কাছে গিয়ে বলেছিলেন, '...আমি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে এই বইখানি লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত না পেলে এই বই আমি ছাপাইতে পারি না। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধি আছে।' ভগবতী দেবী প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'কিছু মাত্র আপত্তি নাই...' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৭: ১৮১)

বিধবা বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে ঠাকুরদাসের প্রকৃত অভিমত কি ছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন বিধবা বিবাহ প্রচলনে ঠাকুর দাস-এর মত ছিল না এবং সেজন্য পরবর্তীকালে তিনি কাশিবাসী হয়েছিলেন। আবার অন্যরা বলেন, বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পর ঠাকুরদাস তার পুত্রকে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। (সরকার,

১৩২৯: ৩২৭ -৩২৮) ঠাকুরদাস যদি বিধবা বিবাহ প্রচলন সমর্থন না করতেন তাহলে তিনি কখনও একথা বলতে পারতেন না যে, 'আমরা উভয় একবাক্যে বলিতেছি এ বিষয়ে যাহা কিছু সহ্য করিতে হয় তাহা করিব এবং আমাদিগকে যখন যাহা করিতে হইবে তাহা সাধ্যমতে ত্রুটি করিব না।'(বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:১০৭) আবার বিধবা বিবাহ প্রচলনকে কেন্দ্র করে ঠাকুরদাসের কাশিবাসী হওয়ার আখ্যানটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ১২৭২ সালের অঘ্রাণ মাসে ঠাকুরদাস একবার একটি স্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়ে কাশি যাত্রা করার সংকল্প করেছিলেন এবং শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরদাসের অভিলাষ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্রকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের লেখা চিঠিতে অথবা সেই চিঠির জবাবে বিদ্যাসাগর যে চিঠি লিখেছিলেন, তার দুটির কোনটিতেই বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত কোনো প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল না। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ১৫৬-৫৭) আবার নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিহারীলাল জানতে পেরেছিলেন যে, ১৮৬৫ সালে ঠাকুরদাস কাশীবাসী হয়েছিলেন। আর ঠাকুরদাস "পুন্যার্থেই" কাশীযাত্রা করেছিলেন বলে নারায়ণবাবু জানিয়েছিলেন। (সরকার, ১৩২৯: ৪১৫-৪১৬) সুতরাং আর যাইহোক, বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য রুষ্ট হয়ে ঠাকুরদাস কাশী যাত্রা করেননি।

বীরসিংহের নিজগৃহের চন্ডীমণ্ডপে কথোপকথনরত ঠাকুরদাস ও ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে ভগবতী দেবী তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি তাহাতে বিধবাদের কোন উপায় নাই কি?' এই প্রশ্ন শুনে ঠাকুরদাস তার ছেলেকে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধানের কথা বলেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জবাব ছিল, "শাস্ত্রে প্রথমত ব্রহ্মচর্য অভাবে সহমরণ বা বিবাহ-এর নিদান রয়েছে।" (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭: ১০৭) তা শুনে ঠাকুরদাস বলেন, 'রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের চেষ্টা ও পরামর্শে, গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক সহমরণপ্রথা নিবারণ করিয়াছেন। আর কলিতে ব্রহ্মচর্যে ধ অপারক; সুতরাং বিধবাদিগের পক্ষে বিবাহই একমাত্র উপায়।' (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:১০৭) এখানে ঠাকুরদাসের বিচক্ষণতা এবং বাস্তববোধ ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করেছে এবং এখানে তার মানবিক দৃষ্টিকোণ পরিস্ফুট হয়েছে। ঠাকুরদাস তৎকালীন সমাজের প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সংস্কারমূলক কার্যাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তিনি সমাজের সেইসব সংস্কারপন্থী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ঈশ্বরচন্দ্রকে বিধবা বিবাহ প্রচলনের উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এমনকি ব্রিটিশ শাসনের সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিও ঠাকুরদাস ইঙ্গিত করেছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পুস্তক প্রচার এবং শাস্ত্রীয় অনুমোদনের পাশাপাশি উপযুক্ত আইন প্রণীত হলে বিধবা বিবাহের বাস্তবায়ণের পথ সুগম হবে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। এছাড়াও ঠাকুরদাস অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে যেভাবে কলিকালে ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থাকে খারিজ করেছেন, তার সেই দৃষ্টিকোণকে হয়তো Common Sense বললে খুব একটা ভুল হবে না।

ঠাকুরদাসের মনোবাঞ্ছা যাই থাকুক না কেন তিনি যথার্থভাবেই অনুমান করেছিলেন যে শাস্ত্রীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে দেশাচারকে অতিক্রম করে বিধবা বিবাহ প্রচলন করা দুরূহ। সেকারণে তার নিজস্ব সম্মতি থাকা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে বলেছিলেন, '...তুমি পুস্তক প্রচার করিবার অগ্রে আরেকবার ধর্ম শাস্ত্র দেখিয়া প্রবৃত্ত হইবে।' (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:১০৭) এই প্রসঙ্গে চন্ডীচরণ লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রাদি হতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং তারপর পুস্তকটির প্রচার করবার আগে তিনি পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। ওই পুস্তকটির আগাগোড়া ঈশ্বরচন্দ্র পাঠ করে পিতাকে শুনিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঠাকুরদাসের মন্তব্য ছিল, 'তুমি বিশ্বাস করো, যাহা লিখিয়াছো তাহার সমস্ত শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে?' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৭:১৮১) ঈশ্বরচন্দ্রের কাছ থেকে ইতিবাচক উত্তর পেয়ে ঠাকুরদাস পুস্তক প্রচারে সম্মতি দিয়েছিলেন। সুতরাং শম্ভুচন্দ্র এবং চণ্ডীচরণ উভয়ের লেখাতেই দেখা যাচ্ছে যে, ঠাকুরদাস বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে যে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন তার প্রতিফলন ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর সুস্পষ্টভাবে পড়েছিল। শুধুমাত্র পিতৃ-আজ্ঞা পালন করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রীয় অনুমোদন অনুসন্ধানের প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাও বলা যায় না। তবে

বিধবা বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করার পশ্চাতে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার ভূমিকাকে অস্বীকারও করা যায় না। পিতার অনুমোদন ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে কতটা অপরিহার্য ছিল সেটা অনুমান করা যায় যখন ঠাকুরদার তার ছেলেকে বলেছিলেন, 'যদি আমি এ বিষয়ে (বিধবা বিবাহ পুস্তক প্রচার) মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে?' ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, 'তাহা হইলে আমি আপনার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার দেহত্যাগের পর আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেরূপ করিব।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৭:১৮১) উল্লেখ্য যে, বিধবা বিবাহের প্রচলন ঠাকুরদাসের কাছে এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে তিনি এই কার্যনির্বাহের জন্য সকল বাধা অতিক্রম করার উৎসাহ প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, "(এই কার্যে) প্রবৃত্ত হইবার পর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না; এমনকি আমরা তোমার পিতা-মাতা; আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না"। (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:১০৮) পিতা ঠাকুরদাসের বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা গেছিল ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে, যখন তিনি শম্ভুচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন, "এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নহি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।" (ঘোষ, ১৯৮৪:৪৫০) সুতরাং বিধবা বিবাহ প্রচলন সংক্রান্ত ঈশ্বরচন্দ্র যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের প্রারম্ভিক পর্বে ঠাকুরদাসের সমর্থন ও অনুমোদন তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তির যেসব নিদর্শন তার জীবনীকাররা নথিবদ্ধ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে আবার কিছু ঘটনা ছিল অতিরঞ্জিত। যেমন—শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে ভগবতীদেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে বাড়ি আসার কথা বলেছিলেন। সঠিক সময়ে বাড়ি পৌঁছানোর তাগিদে ঈশ্বরচন্দ্র বর্ষাপ্লাবিত দামোদর অতিক্রম করেছিলেন। চণ্ডীচরণ লিখেছেন, 'মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কি করিলেন জানতে চাও পাঠক? ভাবিতেও শরীর শিহরিত হইয়া ওঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় আবদারে মায়ের আদেশ পালনের জন্য বর্ষার ভরা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। মাতৃআজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র দামোদরের তরঙ্গ সংগ্রামে জয়ী হইয়া পরপারে উঠিলেন।' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৭:৬৭) এই অতিরঞ্জনকে খারিজ করে শম্ভুচন্দ্র লিখেছিলেন, 'চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে ভরা দামোদর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার কথা যে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ করি চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে দামোদর নদের অতি ভীষণমূর্তি কখনো স্বচক্ষে দেখেন নাই; তার জন্যই এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়াছেন।' (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:২৬০) আবার চণ্ডীচরণ লিখেছেন যে, পিতা ঠাকুরদাস পুত্রের চিন্তাভাবনা, অনুভব, জীবনের আদর্শ ও নিষ্ঠা বুঝতে পারতেন না।" (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৭: ২৫) যদি তাই হয়, তাহলে বিধবা বিবাহের প্রচলনের মত একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রকে অনুমোদন এবং সমর্থন প্রদান করার পরিবর্তে তাকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন ঠাকুর দাস। ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই "বাল্যবিবাহের দোষ" নামক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু পিতা ঠাকুরদাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যবিবাহ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বিবাহ করিতে অগ্রজের আন্তরিক ইচ্ছে ছিল না। যাবজ্জীবন লেখাপড়া শিখিব, সাধ্যানুসারে দেশের উপকার করিব, তাহার এই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কেবল পিতার ভয়ে অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।' (বিদ্যারত্ন, ১৯৪৭:৩২) কিন্তু এই বিষয়েও পিতার প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুযোগ চোখে পড়ে না। তবে জীবনের শেষের দিকে নানা সংসারিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরচন্দ্র অনেক সময় পিতার প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বয়সজনিত কারণে ঠাকুরদাস যখন আর আগের মত বীরসিংহ গ্রামের যৌথ পরিবারকে ঠিকমতো সামলাতে পারছিলেন না তখন ঈশ্বরচন্দ্র বেশ রুষ্ট হয়েছিলেন। আবার ঠাকুরদাসের অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে ঈশানচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নারায়ণ যেরূপ পথভ্রষ্ট হয়েছিল তা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'আপনি না নিরামিষাশী? ...আপনি দুটি বেলা ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন। তবুও আপনি নিরামিষাশী?' (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১:২৫০) কিন্তু ঠাকুরদাসের অসামর্থের প্রতি তিনি যতটা না অসন্তুষ্ট ছিলেন তার থেকে অনেক বেশি ক্ষুব্ধ ছিলেন যৌথ পরিবার

ব্যবস্থার জটিলতাকে নিয়ে। ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য অনেক বক্তব্যে এই যৌথপরিবার ব্যবস্থার প্রতি অনীহা এবং বিরক্তি খুব সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। পিতার সঙ্গে মতান্তর হওয়া সত্ত্বেও পিতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠতা যে অটুট ছিল প্রমাণ পাওয়া যায় কাশীতে বসবাসকালে পিতার উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঈশ্বরচন্দ্র ভক্ষণ করতেন, ঠাকুর দাস ও তাকে নিজ মুখে মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন। (বিদ্যারত্ন ১৯৪৭:২১৩) ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে নিজের বিশেষ আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধের কাজ ও ব্রাহ্মণ ভোজন যথাবিহিত ধর্মমতেই নিষ্পন্ন করেছিলেন। দায়বদ্ধতা রক্ষা করার যে শিক্ষা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা থেকে কখনো ঈশ্বরচন্দ্র বিরত হননি তাই বিনয় ঘোষ যথার্থই বলেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন তার 'টিচার ও ট্রেনার'। (ঘোষ, ১৯৮৪: ১৬)

তবে ঊনবিংশ শতকের দীর্ঘ সময় ধরেই নারীসংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজ আন্দোলিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ও ভারতীয় সংস্কারকদের তৎপরতাতে নারীশিক্ষা প্রসার, সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহকে নিয়ে বিতর্ক প্রভৃতি ঘটনা 'নারী ভাবনাকে' সামাজ জিজ্ঞাসার ভরকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। স্বদেশী যুগের সূচনালগ্নে এবং পরবর্তীকালে দেশকে মাতৃরূপে বর্ণনা করার প্রবণতার মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রকাশ দেখা গেছিল। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে উল্লিখিত 'বন্দেমাতরম' শ্লোকটি মাতৃবন্দনাকে দেশ তথা মাতৃভূমিকে একটি ঐশ্বর্যশালী ও স্নেহময়ী মাতৃ-প্রতিমা রূপে তুলে ধরেছিল। (সরকার, ১৯৯৭ : ১৮১) আবার সুমিত সরকার তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীভাবনার একদিকে ছিল 'আধুনিক স্ত্রী' এবং অন্যদিকে ছিল 'মাতা'। অনেকক্ষেত্রেই ''আধুনিক স্ত্রী''-এর বেড়াজালে আটকে পড়ে ভুগতে থাকা মাতা, মাতৃভূমির দুর্দশার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী যুগের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আবহে নারীকে দেশমাতৃকার সঙ্গে সংযুক্ত করে তার গরীমা কীর্তন করা হয়েছিল—বঙ্গদেশকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। এছাড়াও স্বাদেশিকতার যুগে 'দুর্গা-কালী' প্রভৃতি দেবীমূর্তি একদিকে যেমন শক্তিশালী মাতৃভূমির প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে সেগুলি ছিল দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎসস্থল। (সরকার, ১৯৯৭: ৩০১,৩১৪,৩৪৫) মাতৃরূপে নারী ছিল সমাজচালক পুরুষত্বের আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস। স্বাভাবিকভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের জীবনালেখ্য রচনাকারীদের কলমে এই মাতৃ-বন্দনার প্রতিফলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা ভগবতী দেবীকে নিয়েও সেকারণে একটু বেশি উচ্ছ্বাস দেখা গেছিল, যে উচ্ছ্বাস তাঁর পিতৃদেবকে নিয়ে দেখা যায়নি।

## References


- Banerjee, Ishwar Chandra. 1891. Vidyasagar Charit (autobiography), compiled by Sree Narayan Banerjee, Calcutta: The Calcutta Library
- Vidyaratna, Shambhu Chandra. 1947. Vidyasagar Jibancharit O Bhramnirash. Calcutta: Bookland Private Limited
- Banerjee, Chandicharan. 1367. Vidyasagar. Edited by Bernick Roy. Calcutta: Standard Publishers
- Biharilal, Sarkar. 1329. Vidyasagar (Biography of Ishwar Chandra Vidyasagar with criticism). Published by Sri Haripada Chattopadhyay. Calcutta: Shastra Prakash Karyalaya.
- Roy, Sri Saratkumar. 1341. Vidyasagar Charit. Calcutta: Roy & Co.
- Ghosh, Vinay. 1984. Vidyasagar O Bangali Samaj (Three volumes). Calcutta: Orient Longman Limited.
- Tagore, Rabindranath. 1343. Charitra Puja (Second Edition). Calcutta: Visva-Bharati Library.
- Trivedi, Ramendrasundar. 1320. Charitkatha. Calcutta: Printed and Published by Sri Gopalchandra Niyogi.
- Adhikari, Santosh Kumar. 1970. Vidyasagar, Calcutta: Rupa and Co.
- Sarkar, Pinakesh. 1416 (Autumn Issue). "Vidyasagar". Korak Sahitya Patrika, Calcutta, pages 25-34
- Bandyapadhyay, Anil Chandra. 2011. Vidyasagar. Kolkata: Progotishil Prokashak

- Gandhi, Mahatma. 1367. Ishwar Chandra Vidyasagar. in Vidyasagar Smriti. Vishwanath Dey (ed.). Calcutta: Sahityam, pp. 35-39
- Sarkar, Sumit. 1997. Writing Social History. Calcutta Chennai Mumbai: Oxford India Press
- Bagchi, Moni. 1946. Amader Vidyasagar. Calcutta: Sarat Pustakalaya.


## Other Resources used


- Mukhopadhyay, Narayan Chandra. 1960. Birsingher Simha Sishu. Calcutta: Indian Publishing House
- Nag, Sati Kumar.1978. Vidyasagarer Mata Bhagawati Devi. Calcutta: Orient Book Company
- Mitra, Indra.2019. Karuna Sagar Vidyasagar (Eleventh edition). Calcutta: Ananda Publishers
- Banerjee, Sri Chandichara. 1294, Ma O Chele, Calcutta: Brahma Mission Press
- Mitra, Subal Chandra. 1907. Ishwar Chandra Vidyasagar Story of His Life and Work. Calcutta: New Bengal Press



**Bio Profile of the Author:**
Assistant Professor
Dept. of Political Science
Bankura University, Bankura
**Email:** satrazit69@gmail.com